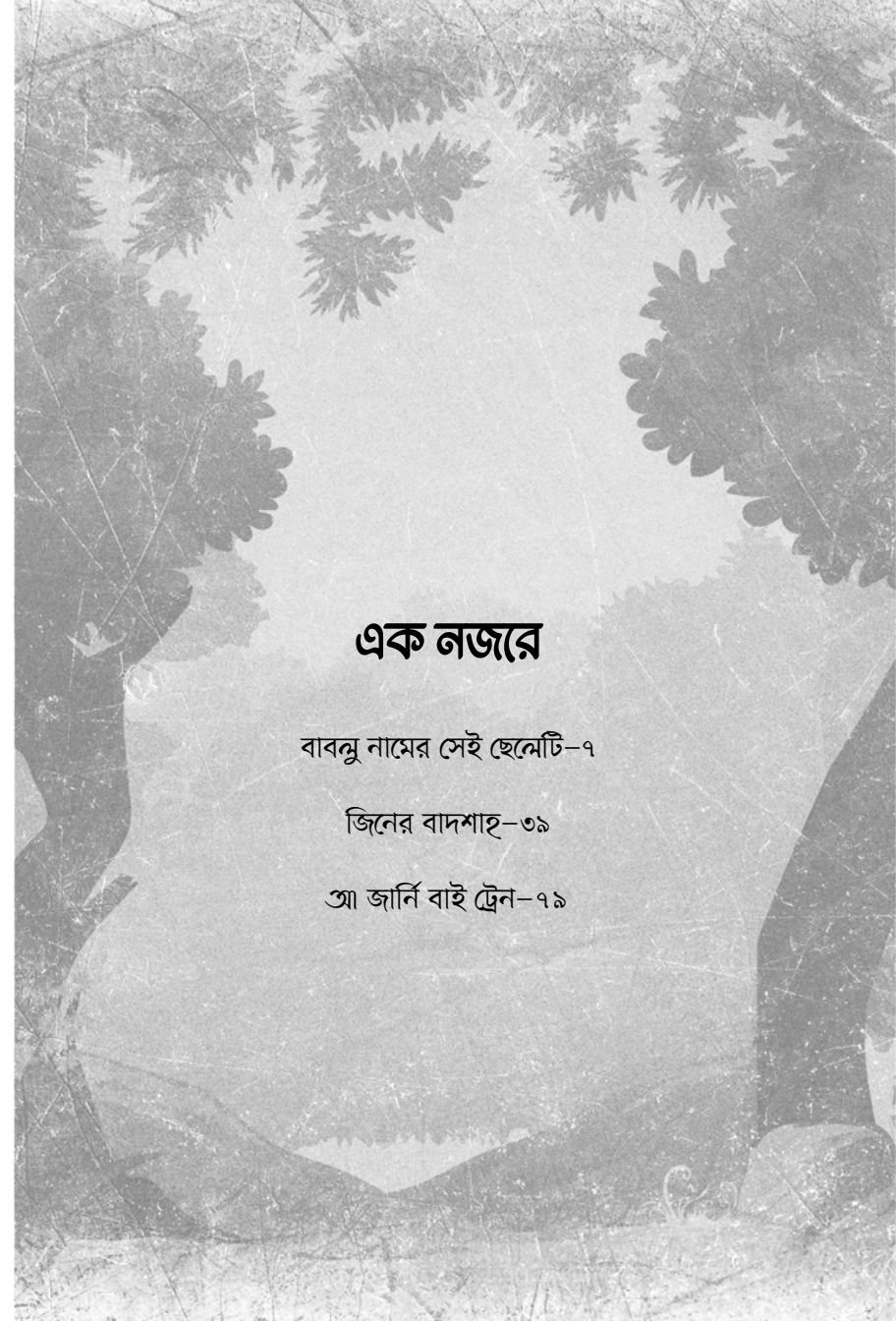


কিশোর অ্যাডভেঞ্চার

ওরা চারজন

জাকিয়া সুলতানা

প্রতিভা প্রকাশ



এক নজরে

বাবলু নামের সেই ছেন্নেটি-৭

জিনের বাদশাহ-৩৯

আ জার্নি বাই ট্রেন-৭৯

বাবলু নামের সেই ছেলেটি



(এক)

ক্লাসজুড়ে পিনপতন নীরবতা। শুধু আমিনুল হক স্যারের গর্জন শোনা যাচ্ছে—‘দুদিন পর পর কোন আসমান থেকে টপকাস তুই?’

জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল বাবলু। পরিচিত দৃশ্য। যত রাগারাগিই করা হোক না কেন, সে কোনো জবাব দেবে না। বাবলুর অপরাধ হলো, সে একদিন স্কুলে আসে তো তিনদিন আসে না। কেন আসে না, কী সমস্যা—কিছুই

সে বলে না। ব্যাপারটা এখন শুধু ক্লাসরুমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। হেডস্যারের রুম পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। হেডস্যার নিজে বাবলুকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। বাবলুর অভিভাবক খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল বাবলুর বাবা নেই। যে বড় ভাই তাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল, সেও রোড এক্সিডেন্টে মারা গেছে বছরখানেক আগে। জানা গেল তার মা-ও অসুস্থ। এসব জানার পরে সবার মাঝে একটা ‘আহা-রে’ ভাব চলে এল। অভিভাবক বলতে কেউ নেই বেচারার!

হেডস্যার বাবলুর মাথায় খুব করে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। ওকে বুঝিয়েছিলেন, ‘দ্যাখ বাবা, তোর কেউ নেই তো কী হয়েছে? আল্লাহ তো আছেন। এই যে আমরা আছি। কষ্ট করে হলেও পড়াশোনাটা কর, ছেড়ে দিস না। পড়াশোনা করে মানুষের মতো মানুষ হলে দেখবি কষ্ট আর থাকবে না।’

কিন্তু, ফলাফল শূন্য। বাবলু একদিন স্কুলে এসেই কিছু দিনের জন্য গায়েব হয়ে যায়। পর পর কয়েকদিন কোনো খোঁজ থাকে না।

আমিনুল স্যার আজ অস্বাভাবিক রেগে আছেন। মনে হয় ক্লাসে কিছু একটা ঘটবে। উত্তেজনা চেপে শান্তভাবে বসে আছে সবাই। আড়চোখে বাবলুর দিকে তাকাচ্ছে অনেকেই।

‘মুখে কুলুপ ঐটেছিস, না? ত্যাঁদড় ছেলে কোথাকার! বেরিয়ে যা ক্লাস থেকে। তোর মতো স্টুডেন্ট আমার ক্লাসে থাকতে পারবে না। যা বলছি, এম্ফুগি যা।’—রাগে গড়গড় করতে করতে বললেন আমিনুল স্যার।

বাবলু নামের সেই ছেলেটি

খুব ধীরগতিতে ব্যাগটা হাতে নিয়ে মাথা নিচু করে ক্লাসের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল বাবলু। চুলগুলো তার একটু বেশিই রুম্ম। ইউনিফর্মে তিল পড়ে গেছে। স্কুলব্যাগটাও বড্ড বেশি মলিন। কারও চাপা হাসির শব্দে ফের গর্জে উঠলেন আমিনুল স্যার—

‘কে রে? কে হাসে? সবগুলোকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবো বললাম। সার্কাস চলছে, না?’

মুহূর্তেই চুপ হয়ে গেল সবাই। আবারও পিনড্রপ সাইলেন্স। বিমর্ষ মুখে বোর্ডের দিকে নজর দিলো ফাহিম। অন্যের অসম্মান দেখতে কখনোই ভালো লাগে না ওর। কদিন পর পর এমন দৃশ্যের অবতারণা হয় ক্লাসে। মজা নেয় সবাই। ওদের চাপা হাসি আর ব্যঙ্গাত্মক চাহনি বলে দেয়—বিষয়টা সবাই বেশ উপভোগ করছে।

টিফিন পিরিয়ডে আশেপাশে কোথাও বাবলুকে দেখতে পেল না ফাহিম।

‘অড্ডুত ব্যাপার!’

‘কী অড্ডুত?’—ভুরু কুঁচকে ফাহিমের দিকে তাকাল ওলী।

‘বাবলুর কথা বলছি। ছেলেটা স্কুলে অনিয়মত এটা ঠিক। কিন্তু ছাত্র খারাপ না। প্রায়ই আমার কাছে হোমওয়ার্ক জানতে চায়। নোটবুক নিয়ে পড়া টুকে নেয়। ওর পড়ার আগ্রহ আছে। কোনো কারণে হয়তো নিয়মিত হতে পারছে না।’

‘আমারও তা-ই মনে হয়।’—বাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে জবাব দিলো রনি।

সুমন মুখ বাঁকিয়ে বলল, ‘তোকে বলেছে, ছাত্র খারাপ না! ফাস্টটার্মে অঙ্কে ফেইল করেছিল, দেখিসনি? নাজমুল স্যার তো বলে দিয়েছে—এবার ফেইল করলে হেডস্যারকে দিয়ে সোজা বের করে দেবে।’

‘খারাপ ছাত্র তাকেই বলে, যে সব সুযোগ-সুবিধা পাবার পরেও পড়তে চায় না, রেজাল্ট খারাপ করে। কিন্তু পড়ার প্রতি ওর আগ্রহ আছে। কোনো কারণে পারছে না হয়তো। তোর মতো সবাই তো আর অঙ্কে একশতে একশ পায় না।’—সুমনের মাথায় হালকা টোকা দিলো ফাহিম।

টিফিন শেষে ক্লাসরুমে ফিরতেই একটা জটলা চোখে পড়ল। ক্লাসের সবাই ভিড় করেছে লাস্টবেঞ্চার কাছে। কিছু একটা হয়েছে ওখানে। ফাহিম, ওলী, রনি আর সুমন এগিয়ে গেল। ওরা দেখল, বাপ্পীর ফর্সা মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে। বাবলুর ব্যাগ ধরে সে বলছে, ‘ব্যাগ চেক করব আমি, ব্যাগ দে।’

চোখ-মুখ শক্ত করে নিজের স্কুলব্যাগের ওপরে হাত রেখে বসে আছে বাবলু।

‘তুই-ই নিয়েছিস আমি জানি। এত দামি ফোন তো কখনো চোখে দেখিসনি, দেখে তাই লোভ সামলাতে পারিসনি। ভালোয় ভালোয় দিয়ে দে বলছি।’—বাবলুর দিকে তর্জনী উঁচিয়ে শাসাল বাপ্পী।

‘আমি তোর ফোন দেখিইনি।’—অবশেষে মুখ খুলল বাবলু।

‘ইইইহ্! ন্যাকা সাজা হচ্ছে। দেখেইনি! তুই খুব ভালো করেই

দেখেছি। বেশি চালাকি করিস না বাবলু। আইফোন সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে তোর? বড় মামা জাপান থেকে পাঠিয়েছে ওটা আমার জন্য। ভালো করে বলছি, দিয়ে দে। নয়তো কী পরিণাম হবে, ভাবতেও পারবি না।’

‘বাবলু তোর ফোন নিয়েছে, তুই জানলি কীভাবে?’—ফাহিম জানতে চাইল।

‘ও ছাড়া আর কে নেবে?’—ফুঁসে উঠল বাপ্পী।

‘আর কে নেবে মানে? আর স্কুলে ফোন আনা নিষেধ, জানিস না? হেডস্যার জানতে পারলে তোর কী অবস্থা হবে—সেটা ভাব আগে। জরিমানা তো হবেই, সেইসাথে...’

‘তুই এই চোরের পক্ষ নিয়ে আমাকে কথা শোনাচ্ছিস?’—ফাহিমের দিকে তাকিয়ে টেঁচিয়ে উঠল বাপ্পী।

‘খবরদার! আমি চোর না। মুখ সামলে কথা বল।’—বলতে বলতে তড়িৎগতিতে বেঞ্চ থেকে লাফ দিয়ে বাপ্পীর নাক বরাবর ঘুসি বসিয়ে দিলো বাবলু।

আচমকা ঘুসি খেয়ে তাল সামলাতে না পেরে মাটিতে বসে পড়ল বাপ্পী। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে বাবলুর দিকে তাকিয়ে রইল ও। নিজেকে সামলে নিতে কিছুটা সময় লাগল বাপ্পীর। নাক বেয়ে সূক্ষ্ম একটা রক্তের ধারা নেমে এসেছে। সেটা মুছে নিয়ে বাপ্পী তোতলাতে লাগল—‘তুই, তুই, তুই আমাকে...তোর এত বড় সাহস!...তোকে, তোকে আমি...’

‘কী হয়েছে এখানে?’—গমগমে কণ্ঠ শুনে সবার নজর ঘুরে

গেল সেদিকে। স্পোর্টস টিচার রেদওয়ান স্যার দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। সবাই চুপ করে রইল।

‘কথা বলছো না কেন কেউ? কী হয়েছে এখানে?’—এবার খানিকটা ধমকে উঠলেন রেদওয়ান স্যার।

সবাই বুঝে গেছে, এখন আর চেপে রাখার কোনো উপায় নেই। ঘটনা হেডস্যার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

‘স্যার, বাপ্পীর আইফোন হারিয়ে গেছে। ওর ব্যাগে ছিল। টিফিন পিরিয়ডে আমরা সবাই বাইরে ছিলাম। বাপ্পী এসে দেখে, ওর ফোন নেই ব্যাগে।’—সজল মুখ খুলল অবশেষে।

‘আইফোন!’—বিস্ময় প্রকাশ পেল রেদওয়ান স্যারের কথায়।

‘জি, স্যার।’—ঘাড় দোলাল সজল।

বাপ্পীর নাকের দিকে তাকিয়ে রেদওয়ান স্যার বললেন, ‘মাই গড! মারামারি হয়েছে নাকি? রক্ত কেন নাকে?’

‘স্যার, আমি জানি ও-ই আমার ফোন নিয়েছে। এ কথা বলেছি বলে আমাকে মেরেছে।’—বাবলুর দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল বাপ্পী। রাগে রীতিমতো ফুঁসছে সে। রেদওয়ান স্যার সেই মুহূর্তে না এলে এতক্ষণে বড় কোনো কাণ্ড বেঁধে যেত নিশ্চিত।

‘কীভাবে জানলে, ও-ই তোমার ফোন নিয়েছে?’ শাস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন রেদওয়ান স্যার।

‘ব্যাগ চেক করলে এখনই জানা যাবে।’—এই বলে বাবলুর ব্যাগটা জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল

বাপ্পী। ক্লাসের সবাই আগ্রহী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সবার মাঝে চাপা উত্তেজনা। এই বুঝি ফোন বেরিয়ে আসে! কিন্তু সবাইকে হতাশ করে কথানা বই, মলিন একটা খাতা, একটা বলপেন ছাড়া আর কিছুই বের হলো না ব্যাগ থেকে।

‘অ্যাই, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস, বল?’—বাবলুর শাটের কলার ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিলো বাপ্পী।

‘অনেক হয়েছে। প্রমাণ ছাড়া একজন মানুষকে তুমি চার্জ করতে পারো না। এই এখতিয়ার তোমাকে কে দিয়েছে? আর কেউ একচুল নড়বে না জায়গা থেকে। আমি হেডস্যারকে ডেকে আনছি।’—বলে গটগট করে চলে গেলেন রেদওয়ান স্যার।

বড়লোক, ক্ষমতাধর বাবার ছেলে বাপ্পী প্রায়ই নানান কাণ্ড ঘটায়। এই বয়সেই বিলাসিতার সব উপকরণ তার হাতে। সুভাবেও বেশ উগ্র। নিত্যনতুন গ্যাজেট আর দামি দামি সব কলম, ঘড়ি ইত্যাদির কারণে বন্ধুসমূহে খুবই সমাদৃত বাপ্পী। তার চারপাশে মাছির মতো কিছু ছেলে সব সময় লেগেই থাকে। যাদের কাজ হলো ওর প্রতিটা কথায় সুর মেলাতে। সেটা ন্যায় হোক আর অন্যায়। বাবলু হলো বাপ্পীর সুভাবের ঠিক বিপরীত। তার না আছে বাবা, না আছে বাবার টাকা, আর না আছে কোনো বন্ধু। সে সাতোও নেই, পাঁচোও নেই। বাপ্পী এবার সেই বাবলুর সাথে দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়বে—তা হয়তো কেউই ভাবেনি। নিজের জায়গায় আগের মতোই চোখ-মুখ শক্ত করে বসে আছে বাবলু।

বাপ্পীর ফোন নিয়ে স্কুলে আসা, নাকি বাপ্পীকে বাবলুর ঘুসি

মারা—কোন জিনিসটা আজকে বিচারে প্রাধান্য পায়, এটা নিয়েই উদ্ভিগ্ন শিক্ষার্থীরা। বোরহানপুর আদর্শ বিদ্যালয়কেতনের ক্লাস সিলেক্টর ছাত্ররা অপেক্ষা করতে লাগল। ঘটনা কোনদিকে গড়ায়—তা দেখার জন্য।

(দুই)

স্কুলের পেছনে সুবিশাল
প্রাচীন একটি
বট গাছ। এই
বটগাছটির প্রকৃত
বয়স এই অঞ্চলের



কেউই জানে না। এলাকার মানুষ বলে, কোনো এক মোঘল সম্রাটের আদেশে নাকি বটগাছটির বীজ বপন করা হয়েছিল। তবে সবই প্রচলিত কথা। সবাই শুনেছে তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে। কতশত ইতিহাসের সাক্ষী যে এই বৃদ্ধ বটগাছ, তার ইয়ত্তা নেই। অনুমান করা হয়, এই বটগাছের বয়স প্রায় ৪০০ বছর। স্কুল ছুটির পরে প্রাচীন সেই বটগাছটির নিচে দাঁড়িয়ে আছে ফাহিম, ওলী, রনি আর সুমন।

কিছুক্ষণ পর ওরা দেখতে পেল—মাথা নিচু করে এগিয়ে আসছে বাবলু। ওর হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, কাঁধের স্কুলব্যাগটি অসম্ভব ভারী। ওকে দেখাচ্ছে ঠিক পরাজিত এক সৈনিকের মতো। আপনমনে হাঁটতে হাঁটতে মেঠোপথটার দিকে এগিয়ে

বাবলু নামের সেই ছেলেটি

গেল বাবলু। বটগাছের নিচে দাঁড়ানো ছেলেদেরকে খেয়ালই করল না ও।

‘বাবলু, অ্যাই বাবলু!’—পেছন থেকে ডাক দিলো ফাহিম।

থমকে দাঁড়াল বাবলু। পেছন ফিরে ওদেরকে দেখতে পেয়ে মুহূর্তেই চোখ-মুখ শক্ত হয়ে উঠল ওর। কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলো, ‘কী হইছে? এখন তোরাও বল, কেন ঘুসি মারলাম। বল। সব দোষ তো আমারই, না? আর তোদের বড়লোক বন্ধু সবার সামনে কোনো প্রমাণ ছাড়াই আমাকে চোর চোর বলছে—সেটা দোষ না? এই পড়াশোনা করে কী হবে বল? এমন শিক্ষার আমার দরকার নাই।’

খানিকটা অবাক হয়ে বাবলুর দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। একসাথে এত কথা বোধ হয় এই প্রথম শুনল ওরা বাবলুর মুখ থেকে।

‘আমরা জানি তোর দোষ নাই। বিনাদোষে চুরির অপবাদ পেলে কারোরই মাথা ঠিক থাকার কথা না।’—বাবলুর সামনে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল ফাহিম।

চুপচাপ ফাহিমের চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বাবলু। এই ছেলেটাকে তার বরাবরই আলাদা মনে হয়। অন্যদের মতো তার সাথে মজা নেবার চেষ্টা করেনি কখনো। কখনো উপহাস করেনি। সম্ভব হলে সাহায্য করেছে। আজও বাপ্পীর অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করেছে।

‘এ আর নতুন কী? এর আগে বাপ্পীর স্মার্টওয়াচ হারানোর

পরেও তো ওয়াসিমকে কত উলটাপালটা কথা বলেছিল। পরে সেটা বাপ্পীর ব্যাগেই পাওয়া গিয়েছিল। ব্যাটা স্কুলে আসেই ভেজাল করতে।—বলতে বলতে বাবলুর পাশে এসে দাঁড়াল রনি।

‘তবুও তো চ্যালা-চামুন্ডার অভাব নাই। তবে যা-ই বলিস, নয়ন কিন্তু খুব ভালো কাজ করেছে। টিফিন আওয়ারে বাপ্পীর ব্যাগ থেকে ফোন নিয়ে হেডস্যারের কাছে জমা দিয়ে এসেছে। বাপ্পীর শিক্ষা হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু মাঝ থেকে বাবলুর সাথে অন্যায় হয়ে গেল।’—ওলীও এসে দাঁড়াল ওদের পাশে।

‘শিক্ষা হবে, না কচু!’—মুখ বাঁকাল সুমন। ‘দেখিস কিছুই হবে না। সরি-টরি বলেই আবার যা তা-ই। ওর বাবা এসেও ছেলের হয়ে সাফাই গাইবেন। ব্যস, আর কী লাগে?’

ওলী বলল, ‘আমার তো মনে হচ্ছে নয়নকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবে না বাপ্পী। ওর সাথে ঝামেলা বাধাবে একটা।’

‘যার যেটা স্বভাব। তবে হেডস্যার অভয় দিয়েছেন নয়নকে। আর বাপ্পীকেও সাবধান করে দিয়েছেন। যা-ই হোক, তুই এটা নিয়ে এত আপসেট হোস না রে। যে মানুষের মন যত সংকীর্ণ, তার আচরণ ততটাই বাজে।’—বাবলুকে উদ্দেশ্য করে বলল ফাহিম।

‘না, আর না। আমি আর পড়াশোনা করব না।’—কঠিন মুখে দুদিকে মাথা নাড়াল বাবলু।

হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওরা বাবলুর দিকে। ‘কী যা তা

বাবলু নামের সেই ছেলেটি

বলহিস? ওই হতচ্ছাড়ার জন্য পড়াশোনা ছেড়ে দিবি?’—
আর্তনাদ করে উঠল যেন রনি।

ওলী বলল, ‘পাগল হলি নাকি?’

‘স্কুল তোদের মতো আদরের দুলালদের জন্য, আমার জন্য
না।’—এই বলেই পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল বাবলু।

‘বাবলু...’—বাবলুকে ডাক দিতে গেলে হাত ধরে ওলীকে
থামিয়ে দিলো ফাহিম। ‘ওকে যেতে দে।’

‘এটা খুব খারাপ হলো। বাবলুর হয়ে কথা বলার কেউ তো
নাই।’—আহত কণ্ঠে বলল রনি।

ফাহিম বলল, ‘তা অবশ্য নাই...আচ্ছা যা তোরা। বিকেলে
মাঠে দেখা হবে।’

‘তুই যাবি না?’

‘আমি দাদুর সাথে দেখা করে যাব। দরকার আছে একটু।
তোরা যা।’—এই বলে বেশ জোরগতিতে হাঁটতে শুরু করল
ফাহিম।

তিন

‘কাল মাঠে
যাসনি যে’?—
ফাহিমের
পাঁজরে কনুই
দিয়ে খোঁচা
দিলো ওলী।



বোর্ডের দিকে
তাকিয়ে সাবধানি ভঙ্গিতে ওলীকে চুপ থাকতে ইশারা করল
ফাহিম। ইয়াসীর স্যারের ক্লাসে টু শব্দ হলে সরাসরি ডাস্টার
ছুড়ে মারেন তিনি! সবাই বলে, বিজ্ঞানীরা নাকি পাগল কিসিমের
হয়ে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞান-শিক্ষকও যে পাগল হতে পারে—তা
ইয়াসীর স্যারকে না দেখলে ছাত্ররা জানতেও পারত না।

বিজ্ঞান ক্লাসে জান বাজি রেখে ফাহিমকে প্রশ্ন করার কারণ
হলো, এই চার কিশোরের বিকেলে মাঠে হাজির হওয়া খুবই
গুরুত্বপূর্ণ। যত যা-ই হোক না কেন, বিকেলে খেলার মাঠে
যাওয়া চাই-ই-চাই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া বা কারও খুব বেশি
অসুস্থতা ছাড়া ওদের এই রুটিনের ব্যতিক্রম হয় না।

গত বছর বার্ষিক ক্রীড়ার সময় ক্লাস এইটের সাথে ফুটবল
খেলতে গিয়ে পা মচকে বিছানাবন্দি হয়ে পড়ে ছিল ওলী।
প্রথম দুদিন বিকেলে মাঠে আসতে না পারলেও তৃতীয়দিন
ঠিকই ওর বাবার হাত ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠে এসে কড়ই

বাবলু নামের সেই ছেলেটি

গাছের ডালে বসে ছিল পা ঝুলিয়ে। আর তার দুদিন পরেই সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের মতো সবার সাথে ক্রিকেট খেলেছিল। বিকেলের খেলার মাঠ শুধু যে ওদের মন ভালো করে দেয়, তা-ই নয়, শরীর চাঙা রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রোল কলের সময় রনি খেয়াল করেছে বাবলু আজ আসেনি। আড়চোখে বাপ্পীর দিকে এক বার তাকাল রনি। বিনাদোষে বাবলুকে কাল এত কথা শুনিয়েছে। কিন্তু কোনো ভাবান্তর নেই বাপ্পীর মধ্যে। নিশ্চিত্তে বসে কী যেন লিখছে খাতায়। বাবলু যে কালকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিজের জীবনের কত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে—সে ব্যাপারে ওরা চারজন বাদে ক্লাসের কেউই জানে না। হেডস্যার বাপ্পীর স্কুলে ফোন আনার কারণে জরিমানা করেছেন। বাপ্পীর বাবাকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। বাবা এসে ছেলের হয়ে সাফাই গেয়েছেন। আর বলেছেন, ভবিষ্যতে এমন হবে না। বাপ্পীর নাকে ঘুসি মেরেছিল বলে সেদিন শাস্তি হয়েছে বাবলুর। বাপ্পী নিজেও বাবলুকে ‘দেখে নেবার’ হুমকি দিয়েছে। সে যে শুধু সন্দেহের বশে বাবলুকে এত কথা শুনিয়েছে—সে ব্যাপারে কোনো অনুভূতিই নেই ওর।

কৌতূহল চেপে সুমন চুপচাপ তার পেন্সিলবক্সের গায়ে আঁকিবুঁকি করছে। ক্লাসে মনোযোগ ধরে রাখা ওর কাছে বিরাট সাধনার ব্যাপার।

টিফিন আওয়ারে সুমন চেপে ধরল ফাহিমকে—‘মিথ্যে বললি কেন কাল? দাদুর কথা বলে কই গিয়েছিলি?’

‘না হলে জরুরি একটা জিনিস মিস করতাম।’

‘কী জিনিস?’—সমস্বরে প্রশ্ন করল সুমন, ওলী আর রনি।

‘বাবলুর ঠিকানা।’

‘মানে? তুই কালকে বাবলুর পিছে পিছে গিয়েছিলি?’—চোখ বড় করে তাকাল সুমন।

‘হুম।’—মাথা ঝাঁকাল ফাহিম।

‘একা গেলি যে? আমাদেরকে বললে কী হতো? আমরাও সাথে যেতাম।’—সমর্থনের আশায় রনি আর ওলীর দিকে তাকাল সুমন। ওরা দুজন মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো সুমনের কথায়।

‘তা হয়তো যেতি। কিন্তু তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে, আর তোরা ভাবতে ভাবতে বাবলুই হাতছাড়া হয়ে যেত। আজ যত সহজে বলছি, কাল কিন্তু তত সহজে রাজি হতি না।’—মাথা নাড়ল ফাহিম।

‘আচ্ছা, তোর কোন কথায় আজ পর্যন্ত রাজি হইনি, বল? যখন যা বলিস, তাতেই রাজি হয়ে যাই।’—খানিকটা রেগে উঠল সুমন।

‘আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে, বাদ দে।’—হাত তুলে সুমনকে থামিয়ে দিলো ওলী। ‘ফাহিম যখন করেছে, তখন ভেবে-চিন্তেই করেছে। তা কী দেখলি?’—ফাহিমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ওলী।

‘অনেক গরিব ওরা। গ্রামে কোনোরকমে টিনের ছাউনি দেয়া একটা ঘরে থাকে। মাথা গোঁজার ঠাঁই ছাড়া আর কিছু নাই ওদের।’

‘ও যে গরিব, এটা তো ওর বেশভূষা দেখেই বোঝা যায়। আর কী জানতে পারলি?’—হাত নেড়ে বলল সুমন।

‘আর কিছু জানতে পারিনি। ওর ঠিকানা দেখে ফিরে এসেছি। পরশু স্কুল ছুটি। একসাথেই যাব সবাই।’

‘গিয়ে কী করব?’—রনির প্রশ্ন।

‘আমাদেরই সহপাঠী এভাবে পড়ালেখা ছেড়ে দেবে, আর আমরা বসে থাকব? কিছু একটা তো করতেই হবে।’—জোরালো কণ্ঠে বলল ফাহিম।

‘আমারও মনে হয়, কিছু করা দরকার।’ সমর্থন দিলো ওলী।

‘বেশ। তাহলে পরশু যাচ্ছি আমরা। সকাল ১০টায় আমার বাসায় চলে আসবি। ঠিক আছে?’—একে একে তিনজনের মুখের দিকে তাকাল ফাহিম।

ঘাড় কাত করে তিনজনই জানিয়ে দিলো যে, ওরা সময়মতো উপস্থিত থাকবে।

(চার)

রেলস্টেশন পার হতে গিয়ে সুমন বলল, ‘আর কতদূর?’

‘মাত্র তো স্টেশনে এলাম। আরও দ্বিগুণ পথ।’—হাসল ফাহিম।

‘বাপ রে! বলিস কী?’—চোখ বড় বড় করে তাকাল সুমন।

‘দেখা যাক, আমাদের বডিবিন্ডার আজ কতদূর হাঁটতে পারে?’—দুট্ট হাসি ফাহিমের ঠোঁটে।

‘ইয়াহু!’—সুমনের ডান বাহুতে মৃদু একটা ঘুসি বসিয়ে দিলো রনি।

‘চ্যালেঞ্জ দিস না বললাম।’—পালটা হাসি দিলো সুমন।

‘দিলাম চ্যালেঞ্জ, যা!’—এবার সুমনের পিঠে হালকা একটা চাপড় বসিয়ে দিলো ওলী।

‘রাখ তোদের চ্যালেঞ্জ। আমাকে হাঁটিয়ে তোদের লাভ? আগে বললে তো সাইকেল নিয়ে আসতাম।’—মুখ বাঁকাল সুমন।

‘উহঁ, আজ শুধু হাঁটাহাঁটি হবে, আর কিছু না।’—ফাহিম বলল।

‘আজ আমাদের সুমনের ওজন আরও হাফ কেজি কমে যাবে।’—হালকা স্বরে বলল ওলী।

‘তা-ই ভালো। তোর মতো জগদদল পাথর হবার কোনো শখ নাই আমার।’—বাঁকা হাসি দিলো সুমন।

জবাবে ড্যামকেয়ার একটা লুক দিলো ওলী।

কথা বলতে বলতে বেশ খানিকটা পথ পেরিয়ে বড় রাস্তা ধরে চলতে শুরু করল ওরা। রাস্তার দুপাশে ছড়ানো-ছিটানো বাড়ি-ঘর। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় আর অনাবাদি খালি জমি।

হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তা পেরিয়ে আচমকা সরু একটা গলির মধ্যে চলতে শুরু করল ফাহিম।

‘রাস্তার আগা-মাথা কিছুই তো বুঝতে পারছি না রে।’—মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল রনি।

হি হি করে হাসতে লাগল সবাই। গলির শেষ মাথায় টিনের

বাবলু নামের সেই ছেলেটি

একটা খুপড়ি ঘর। ঘরের পেছনে বিশাল একটা বাঁশঝাড়।
বাঁশঝাড়ের কাছে এসে থামল ওরা। চারপাশটা দেখে সুমন
বলল, ‘কেমন গা ছমছমে জায়গাটা!’

ঘরের দিকে আঙুল তাক করে ফাহিম বলল, ‘ওটা বাবলুদের
ঘর।’



‘এটা?’—ঘরের দিকে
তাকিয়ে একইসাথে
বলে উঠল বাকি
তিনজন।

‘হুম।’

‘চল তো দেখি, বাবলু
কী করছে।’—দু পা

এগিয়ে গেল রনি ঘরের দিকে।

ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তর্জনীর মধ্যমাংশ দিয়ে দুবার
দরজায় নক করল ফাহিম। কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে হাতের
তালু দিয়ে দুটো বাড়ি দিলো দরজায়। এবারও কোনো সাড়া না
পেয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল ওরা। টিন কেটে চারকোণা
একটি জায়গা বের করা হয়েছে। এটাই জানালা। জানালার
সামনে সাদা এক টুকরো চট ঝোলানো আছে। ভেতরের কিছুই
দেখা যাচ্ছে না। সুমন হাত বাড়িয়ে চটটা সরানোর চেষ্টা
করতেই ওকে বাধা দিলো ফাহিম।

‘উঁকি দিস না ভেতরে।’